International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

রাজবংশী বিবাহ প্রথার গণনশৈলী এবং তার রূপান্তর (১৯৪৭-৯৭)

সুরজিৎ বর্মন
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

বিবাহ একটি পরিপূর্ণ অর্থবহ শব্দ। বিবাহ হল সন্তানসম্ভবা পরিবার প্রতিষ্ঠার একটি সামাজিকভাবে অনুমোদিত উপায়।[১] হিন্দুশাস্ত্র মতে, দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ দশমতম সংস্কার[২] যাকে কেন্দ্র করে চিরাচরিত প্রথা ও সামাজিক রীতিনীতি একদিকে যেমন গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত সামজিক কাঠামো তৈরিতে সহায়তা করছে, অন্যদিকে তেমনি সেই জাতির ধর্মীয় আঙ্গিককে পরিশীলিত ও পরিবর্তিত করে চলছে নিদারুণ প্রাণোচ্ছ্বাসে। এই গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার আবর্তন হতে পৃথিবীতে খুব কম জাতিই রয়েছে যারা নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে পেরেছে, রাজবংশী জনজাতির স্বতন্ত্রতা রক্ষার তাগিদ বরং সেই আবর্তকেই ইন্ধন জোগাতে উৎসাহ জুগিয়েছে দ্বিধাহীন চিত্তে। বলাটা বাঞ্ছনীয় হবে যে, বিবাহের রীতিনীতির মধ্যে নানাবিধ প্রথা এবং বিশ্বাসগতভাবে একটি প্রগাঢ় রক্ষণশীলতার ভাব সব দেশে, সব সমাজে এবং সর্বকালেই বজায় থাকে, অন্তত মানসিক ভাবে তো বটেই।[৩] পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে রাজবংশী সমাজ নিঃসন্দেহে তার ব্যতিক্রম ছিল না।

পরিবর্তিত রাজবংশী সমাজ যে সর্বত্র সমান মিল রেখে চলেছে তা কিন্তু নয়। রাজবংশী সমাজে জাতিভেদ প্রথা[৪] না থাকলেও ধনী-গরিব ভেদাভেদের ভিত্তিতে বিবাহ রীতিতেও খানিকটা নিয়ম-কানুনের হেরফের লক্ষ্য করা যায়। বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান প্রজনন। সে দিক থেকে মেয়েদের প্রজনন শক্তির, উর্বরতার উপর বিবাহের সাফল্য ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।[৫] রাজবংশীরা মেচ, রাভাদের চেয়ে বরাবরই উচ্চ সম্প্রদায়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন।[৬] সম্ভ্রান্ত রাজবংশী পরিবারে যে সমস্ত নিয়মকানুন বিবাহে লক্ষ্যণীয়, তা কিন্তু পিছিয়ে পড়া এবং নিরক্ষর রাজবংশী সমাজে কিছুটা হলেও ভিন্ন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিবাহের রকমফের। সময়ের তারতম্যে বহু ক্ষেত্রেই ঘটে গিয়েছে উলট পুরাণ। আলোচ্য প্রবন্ধে রাজবংশী সমাজের একটি নির্দিষ্ট নিয়মিত

বিবাহের, যা 'ফুল বিয়াও' (ব্রাহ্ম বিবাহ) নামে পরিচিত, পরিকাঠামো উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে মাত্র।

ঘটকের ভূমিকা : ঘটক ঘটকালির মধ্য দিয়ে পাত্র বা পাত্রীর সম্বন্ধ নিরুপণ করে। স্বাধীনোত্তর উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশে রাজবংশী অধ্যুষিত জনসমাজে ঘটক (ঘটকি) বা বার্তাবাহকের মাধ্যমে পাত্র/পাত্রীপক্ষের চাহিদা অনুসারে পাত্র/পাত্রীপক্ষকে যৌতুক প্রদান করে। সবসময়েই পাত্রীর পিতা যোগ্যতা সম্পন্ন পাত্রকে তাঁর মেয়ে অর্পণ করতে চাইতেন। যোগ্যতা বলতে পাত্রের জমির পরিমাণ, গরু, ধানের গোলা, কোন কাজ করার দক্ষতা ইত্যাদি লক্ষ্য করা হতো। পাত্র পছন্দ হলে কন্যাপণের কথা উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচিত হতো। মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ঘটক উভয় পক্ষের মধ্যে দেখাদেখির দিনক্ষণ স্থির করতো। এর জন্য ঘটক কোনো রকম বকশিস নিতেন না। পাঠাভাতই সন্তুষ্ট ছিলেন। কেননা বিবাহ বন্ধনকে একদিকে যেমন পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হতো, অন্যদিকে তেমনি বিবাহ ঘটিয়ে দেওয়াও পবিত্র কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু তা সর্বত্র সমান ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই 'প্রফেশনাল ম্যাচ-মেকারস (professional match-makers) বা ঘটকও ছিলেন।[৭] এইচ. এইচ. রিজলে বলেছেন যে, বিবাহের জন্য পেশাদার ঘটক নিয়োগ করা হত। সাধারণত কনের পিতাকেই ঘটক নিয়োগের উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। ঘটক ২০০টি পান এবং ৮০টি সুপারি সমেত পাত্রের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে তিনি অন্ততঃ তিনদিক থাকেন। এই সময়ের মধ্যে উভয় পরিবারের ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এমনকি কন্যাপণের দাম নিয়েও দরকষাকষি করা হয়।[৮] প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, রাজবংশী সমাজে গুয়াপান আসলে সুখ সমৃদ্ধির প্রতীক। আলোচ্য সময়কালে এতদঞ্চলের গ্রামের ছবি দ্রুত পরিবর্তিত হলেও পান সুপারির সংস্কৃতি এখনো পর্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে যায়নি।[৯] কিন্তু বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত রাজবংশীরা বরপণ নিতে আরম্ভ করলেন, ক্রমে তা সর্বস্তরে প্রসারিত হতে লাগলো এবং সেই ধারা আজও বর্তমান। ড. চারু চন্দ্র স্যানাল মনে করেন, বর্ণহিন্দুরা কন্যার অভিভাবকের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে পণ দাবি করতেন, সম্ভবত তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট মেলামেশার ফলেই রাজবংশী সমাজে এই বিপরীতমুখী ধারা চালু হয়েছে।[১০]

গোত্র : একথা স্বীকৃত যে, সামাজিকতার দিক থেকে বিবাহে গোত্র একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিঃসন্দেহে রাজবংশীদের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। রাজবংশীরা কাশ্যপ গোত্রীয়।[১১] স্বরাজ বসুর ভাষায়—''তাঁরা

বহিরাগত গোষ্ঠী বা গোত্রে বিভক্ত ছিল না, কিন্তু একটি একক অন্তঃবিবাহিত গোষ্ঠী গঠন করেছিল। তাদের একটি মাত্র গোত্র ছিল, অর্থাৎ কাশ্যপ এবং একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ তাই একটি সাধারণ রীতি ছিল"[১২] এটি ছিল প্রচলিত ''গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি (orthodox Brahminical cupture) থেকে একটি বিচ্যুতি।[১৩] এ প্রসঙ্গে হরিকিশোর অধিকারীর মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে—কোচবিহারের মহারাজা বিশ্ব সিংহের রাজত্বকালে (১৬ শতকের গোড়ার দিকে) কোচরা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যেখানে বিশ্ব সিংহের রাজত্বের আগেই রাজবংশীরা হিন্দু ছিলেন এবং তারা ভঙ্গ ক্ষত্রিয় হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন।[১৪] তবে ক্ষত্রিয় নামে পরিচিতি ও স্বীকৃতি[১৫] পাওয়ার আগে এই রাজবংশী সমাজের দশবিধ সংস্কারের কাজ করতেন অধিকারীরা।[১৬] উল্লেখ্য যে, বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাধারণ পরিবারের লোকেরা অধিকারীর মধ্যমেই বিবাহ অনুষ্ঠান করতো। সম্ভবত এই সময়ের পর থেকেই সামাজিক দিক থেকে অগ্রগণ্য রাজবংশীদের বিবাহ অনুষ্ঠান কামরূপী ব্রাহ্মণদের দ্বারা সম্পন্ন হতে থাকে।[১৭]

সুবাসুবির দিনক্ষণ[১৮]: ঘটক পাত্র বা পাত্রী পক্ষের আগ্রহের উপর পাত্র বা পাত্রী দেখাতেন।পাত্রপক্ষ প্রথম আগ্রহ দেখালে ঘটক শুরুতেই জেনে নেন যে বরপক্ষ কন্যাপণ কত দেবেন এবং কেমন পরিবারের পাত্রীকে গৃহবধূ হিসেবে বরপক্ষ গ্রহণ করতে চান। পাত্রীর বয়স নিতান্তই অল্প হওয়ায় পাত্রীর গুণ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতে চাওয়া হয় না। মূলত বংশ পরিচয় এবং পাত্রীর পিতা-মাতার সামাজিক সন্মানের উপর সম্বন্ধ স্থির করা হয়। অনুরূপভাবে, পাত্রীপক্ষ আগ্রহ দেখালে ঘটক শুরুতেই জানতে চান কেমন কর্মঠ পাত্র দরকার এবং কন্যামূল্যের[১৯] পরিমাণ কেমন হতে পারে। উল্লেখ্য, চাহিদা অনুয়ায়ী কন্যাপণ দিতে না পেরে অনেক পাত্রই পছন্দ অনুয়ায়ী পাত্রীকে বিবাহ করতে পারতেন না। শুধু তাই নয়, কন্যাপণ দিতে না পেরে অনেক পাত্রকে চিরকুমার থাকতে হয়েছে, এমনও নজির রয়েছে। অন্যদিকে, সমাজ পরিবর্তনের ধারায় কন্যাপণের পরিবর্তে যখন বরপণের প্রচলন ঘটলো, অনুরূপভাবে তখন অনেক গরীব পিতা বরপণ দিতে না পেরে 'দুদিয়া গাবুব এর'[২০] সাথে মেয়ের বিয়ে দিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, বরপণ দিতে না পারার জন্য মেয়েটিকে চিরকুমারী থেকে যেতে হয়। যাইহোক, বার্তাবাহকের মাধ্যমে উভয় পক্ষের চাহিদায় মধ্যস্থতা হলে উভয় পক্ষ একে অপরের গৃহে এসে বিবাহের দিনক্ষণ নির্ধারণের প্রস্তাব রাখতেন। হান্টার সাহেব

জানাচ্ছেন যে—"...an auspicious day is fixed in consultation with the family astrologer, on which day the parents or relatives of the bridegroom send a quantity of betel-leaves and betel-nuts to the house of the bride."[২১] বলা বাহুল্য, বিবাহের শুভ দিন নির্ধারণের জন্য একজন জ্যোতিষীর পরামর্শ, সেইসঙ্গে দুই পরিবারের আলোচনার গুরুত্ব বাড়লেও পান-সুপারি পাঠানোর মত নিয়ম আলোচ্য সময়ের শেষান্তে প্রায় উঠেই যায়।

এছাড়াও পাত্রী বা পাত্র দেখতে যাওয়ার সময় বা বিবাহের দিনক্ষণ ঠিক করতে যাওয়ার সময় পথে মৃতদেহ, জোক, কলা, সাপ, কোন মহিলার চুল ছেড়ে ঘোরাঘুরি করছেন ইত্যাদি অশুভ লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতো। অনুরূপভাবে দুধ, ফুল,, মাছ ইত্যাদি শুভ লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতো।[২২] লক্ষণীয় যে, আধুনিকতার ছোয়ায় এই ভাবনা রাজবংশী সমাজে ক্রমশ শিথিল থেকে শীতলতর হচ্ছে। তবে, পরিবারে কেউ বা নিকটত্মীয় মারা গেলে কিংবা শিশুর জন্ম হলে অশৌচ পালনের পরে নতুন করে বিবাহের দিন ধার্য করা হয়।

সুবচনী পূজা : কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী সমাজে কোথাও কোথাও বিবাহের পূর্বেই সুবচনী পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই পূজা মূলত গৃহস্থের বাড়ির তুলসী মঞ্চের পাশে কলার নেওয়াইচপাতে গোটা পান-সুপারি, চুন, সিঁদুব, তেল ইত্যাদি নিবেদন করা হয়। নৈবেদ্য প্রদত্ত দ্রব্যাদির উপরে পাঁচটি বা সাতটি করে সিঁদুরের ফোটা দেওয়া হয়। পূজোর শেষে পূজোয় প্রদত্ত পান-সুপারি সকলের মধ্যে প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করে পাত্র বা পাত্রীর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া হয়।[২৩] কথিত আছে, এতে ঠাকুর সন্তুষ্ট হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে কোথাও দেবীর মূর্তি[২৪] বানিয়েও শুবচনী বা সুবচনী পূজার প্রচলন আছে।

নিরীক্ষণ (আশীর্বাদ) : এটি বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ। অনুষ্ঠানটি বিয়ের অন্তত ১০ থেকে ১৫ দিন আগে হয়। আবার আগে না হলে বিয়ের দিনই বিবাহের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই বাড়ির অল্প কয়েকজন লোক কনের বাড়িতে নিরীক্ষণ করতে যান। কিন্তু মনে রাখার বিষয়, বরের বাড়িতে নিরীক্ষণ বিয়ের কিছুদিন পূর্বেই করতে হয়। এই দিনেই বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। আবার অনেক সময় তারও পূর্বেই শুভ দিনটি স্থির করা হয়। নিরীক্ষণের সময় পরিবেশিত হয় বিভিন্ন রকমের গান। তার একটি এখানে তুলে ধরা হল—

১

বড়ো নদীর পাড়ে পাড়ে কিসের বাইজ বাজে।
বাইজতো নোয়ায় বাবা বালীর নিরিক্ষণ আইসে।।
দুধ ভাত খায়া ময়না নিন্দ ভালা গেইছে।
কোনবা মারেয়ার বেটা হাওয়াই মারায়েয়া আইসে।।
বন্ধুদের হিরারে হিরি চম্‌কিল ময়নার গাও।
সুন্দর ময়না বালীরে নিরিক্ষণ আইসে।
আবার নিরিক্ষণের সময় বরপক্ষ গুয়া (সুপারি) নিয়ে আসে।
বৈরাতীরা সেই গুয়া কাটে আবার সেইসঙ্গে গানও গায়—

২

জিরকিটি গুয়ারে আইমোর বরাইব কচিপান
হুর আসিছে বরের বাবা বুড়া হনুমান।
কইনার বাবা বসিয়া আছে উত্তম সিংহাসন।।
জিরকিটি গুয়ারে আইসোর বরাইর কুচী পান
হুর আসিছে বরের কাকা বুড়া হনুমান।
কইনার কাকা বসিয়া আছে রত্ন সিংহাসন।।[২৫]

অধিবাস : এটি সাধারণত বর-কনের মঙ্গলার্থে ঈশ্বরের নিকট আর্শীর্বাদ প্রার্থনার্থে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। বিবাহের আগের দিন উপবাস করে দুপুরের কিছু পূর্বে স্নানাদি সেরে পাত্র-পাত্রী উভয়পক্ষই যে যার বাড়িতে তুলসী মঞ্চের সামনে বসেন। সাধারণ রাজবংশী পরিবারে একটি মাটির ঘটে আমের পল্লব, একজোড়া পান সুপারি সিঁদুর সমেত, লাল শালুক দিয়ে মুড়ে পাত্র-পাত্রীর সামনে রাখা হয়। উল্লেখ্য যে কোথাও কোথাও সম্ভ্রান্ত রাজবংশী পরিবারে অধিবাসের দিন থেকেই দেশি বাদ্যযন্ত্রসমেত সানাই বাজে। বিশেষ করে মেয়ের বাড়িতে সানাইয়ের সুর এইদিন থেকেই সবাইকে বেদনাহত করে তোলে। যাইহোক, রাজবংশী সম্প্রদায়ের অধিকারী ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে তুলসির পাতা দিয়ে ঘটের জল পাত্র/পাত্রীকে ছিটিকে দেন। বলাবাহুল্য, উভয় পরিবারই এই অনুষ্ঠানটি করে থাকে। পাত্র-পাত্রী বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থণা করেন।[২৬]

মিতর ধরা : বিবাহের বিশেষ আকর্ষণ হল পাত্র তাঁর এক স্থানীয় বন্ধুকে মিত্র ধরবেন। পাত্র তাঁর বন্ধুকে বাজনাপাট্টি নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানায় আগামীকাল যাতে তাঁর বিবাহে সে মিতর ধরে। রাজবংশী সমাজে কন্যা

সম্পদানের পর মিতর ধরা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। পাত্র বা পাত্রী পক্ষ থেকে জলছিটা অনুষ্ঠানের পূর্বেই মিতর ধরা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়। ড. দিলীপ কুমার দে 'কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-২৪১) জানাচ্ছেন যে উক্ত অনুষ্ঠানের নির্ঘন্টে একটি জলপূর্ণ আম্রপল্লব সহ কলসি হাতে নিয়ে পাত্রের বন্ধু পাত্রের হাতে তুলে দেন।...মাঙ্গলিক মন্ত্রোচ্চারণের পর নতুন মিত্র নিজ হাতে পাত্রটি রেখে দেন। মিতর সম্পর্ক স্থাপনের দরুন সে তার মিত্নী কে কিছু বিশেষ উপহার সামগ্রী যেমন, শাড়ি, ছায়া, ব্লাউজ, কুমকুম, চোখের কাজল, লিবিসটিক, সিঁদুর, ছোট্ট একটা আয়না, চিরুনি, মেহেন্দি, ক্রিম ইত্যাদি দেন। এভাবেই সম্পন্ন হয় এই অনুষ্ঠানটির। এই সময় মিতর একে অপরকে নমস্কার জানান এবং এখন তারা একে অপরকে মিতর বলে সম্বোধন করেন এবং উভয়ের বাবা-মাও, 'সোংরা-সুংরী' বলে একে অপরকে সম্বোধন করেন। বিবাহের পর মুহূর্তগুলো যেমন পথফেরানো, পাত্রের শ্যালক-শ্যালিকার সঙ্গে মশকরা ইত্যাদি খুনসুটিগুলো পাত্রের সঙ্গে মিত্র উপভোগ করে থাকেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হয়। গবেষক ধর্ম নারায়ণ বর্মা জানাচ্ছেন যে, ''রামায়ণ মহাভারতের যুগ থাকি মিতর ধরার নিয়ম আর্যাবর্তত আছে। বিয়ার সমাইত সেই সনাতন প্রক্রিয়ার অনুকরণ করা হয় এই অঞ্চলত। ...মিতর বা মিত্র বিয়ার সাক্ষী হিসাবত গণ্য হয়।[২৭] এমনকি, মিতরের মৃত্যু হলে তিন দিন কিংবা পাঁচ দিনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে হয়।লেখক চারুচন্দ্র সান্যাল বলেছেন, মিতর ধরা অনুষ্ঠান এখন খুব কমই হয় এবং উন্নত রাজবংশীদের মধ্যে এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে বাতিল হয়েছে।[২৮] বলা বাহুল্য, রাজবংশী সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এমনকি বর্তমান প্রজন্মও এতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।

বিয়ের দিনের অনুষ্ঠান—

যোলমাতৃকা পূজা : পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ তথা অব-হিমালয় অঞ্চলের উত্তরাংশে সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ পাত্র/পাত্রীর বিয়ের দিন বংশগত ও পারিবারিক ঐতিহ্য অনুয়ায়ী প্রচলিত দেব-দেবীর পূজা করে থাকেন। এই অনুষ্ঠান একদিকে যেমন লোকাচার যোলমাতৃকা পূজা অন্যদিকে তেমনি বংশের পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানও। এই শ্রাদ্ধশান্তির অনুষ্ঠানকে 'মানিমুনি' শ্রাদ্ধ বলা হয়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই দিন পাত্রকে ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা উপবীত গ্রহণ করতে হয়। এই পূজার সময় কনের পিতার হাতে কাশিয়ার আংটি

এবং কুচ থাকবে, যেটি ব্রাহ্মণ তৈরি করে দেয়। আতপ, কলা, দুধ, চিনি, গুড় দিয়ে মেখে পিণ্ড তৈরি করা হয়, ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে এক মুঠো করে পিণ্ড পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। পিণ্ড দেওয়ার পর কোনোই ধোয়া জল পিণ্ডতে নিবেদন করতে হয়। একটি সাদা রঙের সুতো দিয়ে পিণ্ডটিকে পুরোহিত ঘিরে দেন। এরপর কনে ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পিতার দ্বারা শান্তির জল দিয়ে শুদ্ধ হন। এরপর কনে পূর্বপুরুষের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। প্রার্থনা শেষে পুরোহিত মশাই এবং বাড়ির বড়দের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। এই সময়ে বাড়ির আঙ্গিনার পশ্চিম প্রান্তে ঘাট তৈরি করে রাখা হয়, জলভরী যাত্রা ফিরে আসার পরে কনেকে এই ঘাটে নেওয়ানো হয়। ইতিমধ্যেই বৈরাতী বা বয়ঃজেষ্ঠ্য কোন ব্যক্তি ভুরা তৈরি করেন এবং বাড়ির ও গ্রামের অন্যান্যরা মিলে জল ভরতে যান। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয় হরগৌরি পূজাও। বিবাহ অনুষ্ঠানের দিন বাড়ির উত্তর দিকের ঘরের দেওয়ালে (চাটিতে) মাটি দিয়ে সামান্য অংশে লেপে সেখানে দুটি কড়ি বসানো হতো; ডানদিকের কড়ি বরের নামে আর বাম দিকের কড়ি কনের নামে। তারপর সিঁদুরের ফোটা দিয়ে মাটি দিয়ে লেপা অংশটি সুন্দর করে সাজানো হয়। এই পূজার প্রধান উপকরণসমূহ সবই ষোলোটি, যেমন-ষোলোটি পাইকর পাতা, বট পাতা ষোলোটি, ষোলটি বড়ই পাতা, মনুয়া কলা ষোলোটি (যমজ কলা বা যামটিয়া কলা চলবে না কিংবা অন্য কলা চলবে না) কাঁচা সুপারি ষোলোটি,পান ষোলোটি, একটি খটুয়া, বেলপাতা, দুর্বা ঘাস, একটি গামছা, একটি আমের পল্লব, একটি ঘট, তিনটি বা পাঁচটি দেওয়ারী সমেত তেল-সলতে, আতপ চাল, তুলসী পাতা, ফুল-ফল ইত্যাদি ছাড়াও এই পূজায় পাত্রের বাড়িতে পাত্র ষোলো মুঠি চাল, আর পাত্রীর বাড়িতে পাত্রী ষোলো মুটি চাল পূজায় অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে এই পূজার শেষে পুরোহিত মশাই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পিতার মাধ্যমে পুত্রকে পইতা পরিয়ে দেন এবং হাতে কুঞ্জ তুলে দেন। এরপর তিনজন বা পাঁচজন মাথায় পাথর চেপে ধরে ব্রাহ্মণের দেওয়া তুলসী কয়েকবার লেপন করেন।এই পূজা-অর্চনা শুরু হওয়া নির্ভর করে ব্রাহ্মণের আসার সময় এর উপর, অনেক সময় নির্ধারিত সময়ে ব্রাহ্মণ আসতে না পারলে পর মুহুর্তে যখন এসে পূজা শুরু করেন তখন ব্রাহ্মণকে অনেক রসিকতার সম্মুখীন হতে হয়, বাড়ির মেয়েদের বলতে শোনা যায়—

৩

হরগরি পূজা রে বামন ট্যার চৌখে দ্যাখে

চাইলনের কলা রে বামন কোত্ কোত্ে গিলে,
আলো ধানের গুঁড়া রে বামন ফাকামারি খায়।
ঘটে রে জল বামন কুলকুলি করে
আড়াবাড়ির হাফানি পান মুখসুদ্ধি করে।
ছুয়াবান্নির খাঁটি রে বামন দাঁত খিল্লান্ করে
বামন ক্যানে নরে, বামন ক্যানে চরে
বামনের টিকাত্ জোঁক সোনদাইছে টানাটানি করে।

৪

বামনের বোলে দুই ভাই
বামনের মাইয়া বিলেত যাই।
বিলেত গেইলে পামো ধুতি-চাউল
বামনের মাইয়া আছে রে কুলাত ঢাকোন দিয়া
কতক্ষণে আসিবে বামন ধুতি-চাঁদর ধরিয়া।
বামনের বলে দুই ভাই, চলো দাদা বিলেত যাই
বিলেত গেইলে পামো চাউল সিদা
বামনের মাইয়া আছে রে হাড়ি-পইলা ধুইয়া।
কতক্ষণে আসিবে বামন নাল-নাটি
ঘাড়ে দেখি অঙিন ছাতি।
শুয়োর চড়া বামন বাড়ির দক্ষিণ দিয়া
শুয়োরের পালে পালে বগলা পড়ে
হাতেরে নাটি দিয়া বামন বগলা মারে।
বামনের মাইয়া আছে রে কড়াইত তেল চড়ে দিয়া
কতক্ষণে আসিবে বামন মাছ-মাংস ধরিয়া।[২৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাজবংশী সমাস-সংস্কৃতিতে পুরুষ অপেক্ষা নারীদের অবদান অনেক বেশি। মেয়েরা এই সমস্ত পূজার্চনার আয়োজনাদিও নিষ্ঠাসহকারে পালন করে। স্নানাদি সেরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পড়ে যৈগের ভাত খেয়ে বৈরাতী পূজার আয়োজন করেন। তবে এক্ষেত্রে কঠোরভাবে যে নিয়মটি পালন করা হয়, তা হল বৈরাতীকে অবশ্যই সদবা হতে হবে।[৩০] বৈরাতী চাইলোন বাতি সাজিয়ে দেন, এক কুলো ধান দেন এবং তার উপর দুটো দেওয়ারীতে তেল ও সইলতা সমেত রাখেন; ডানদিকের দেওয়ারি বরের নামে ও বাম দিকের দেওয়ারী

কনের নামে। প্রচলিত বিশ্বাস যে, পূজার প্রয়োজনে বর-কনের নামে রাখা বস্তুর ক্ষেত্রে ডান দিকে বরের নামে রাখলে ও বাম দিকের বস্তু কইনার নামে রাখলে বৈবাহিক সম্পর্ক সুমধুর হয়।

যাইট(ল) বিষহরি পূজা : শোলা দিয়ে তৈরি মনসা মূর্তির আর এক নাম 'সাইটো(ল) বিষহরি' অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবী রাজবংশী সমাজে। রাজবংশী পরিবারে বিয়ের আগে 'সাইটো(ল) বিষহরি পূজা আবশ্যিক কর্তব্য।[৩১] এই পূজার শুরু থেকে ঠাকুর ভাসানো পর্যন্ত বৈরাতীরা নানা ধরনের গান করে থাকেন। যেমন ঠাকুর বসানোর সময় এই ধরনের গান করেন—

৫

ঢোওংল কাটুলুং ধাই রে ধাই
নেওয়াইজ বসালুং ঠাই রে ঠাই
স্বর্গেরও দেবগণ মঞ্চে ফ্যালান পাও
কার কোন খান নেওয়াইজপাত চিহ্নো করিয়া ন্যাও।

অনুরূপভাবে, ঠাকুর ভাসানোর সময় গাওয়া হয়ে থাকে—

৬

ঝেচু করে চিলিমিলি
কুড়ুলায় করে আও
উটো উটো পঞ্চদেবতা
চেতন করো গাও
ধুপধুনার বাস্না পায়া
কত নিদ্রা যাও
ক মা কোন ঘাটে তোর ভাসাবে ভুরা
যে ঘাটে চ্যাংরায় ছিল্লান করে সে ঘাটে মোর ভাসান ভুরা
কা গা যে ঘাটে জল খায় সে ঘাটে না ভাসান ভুরা।[৩২]

লোকমুখে প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে যে, দেবীর রোষ/অভিশাপ থেকে বাঁচতে কিংবা দেবীকে সন্তুষ্টির জন্য রাজবংশী সমাজের মানুষ এই পূজা করে থাকেন। অবস্থাসম্পন্ন রাজবংশী পরিবারে এই পূজা বিবাহ ছাড়াও অন্নপ্রাশনের মতো পারিবারিক উৎসবেও সাতদিন সাতরাতব্যাপী চলতে থাকে। বিমলা দেবী আক্ষেপ করে বলেছেন—'হামরা গাবুর থাকাতে সাইটো বিষহরি পূজাত্ যে গানগুলো কচ্ছলম্ এ্যালাকার গিদালির ঘর ঐল্যা গান করির না পায়। এলা উমরা টিপির

গান কয়।' এটা বলা দরকার যে, বিবাহের বিভিন্ন পর্বে যে গানগুলো গাওয়া হতো তা আলোচ্য সময়ের শেষার্ধে অবলুপ্তির পথে ধাবিত হয়েছে।

পাঁচ জনি পাতা : উক্ত পূজাদি সম্পন্ন হলে গ্রামের প্রবীণ পাঁচ জন মানুষকে আগের থেকেই খাবারের আমন্ত্রণ জানানো হয়। নিয়ম আছে যে,এই প্রবীণ ব্যক্তিরা বরের বাড়িতে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে (পাঁচজনি খান) শাঁখা-সিঁদুরের ভার নিয়ে পাত্রীর বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেন। পাঁচজনিরা অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের ক্ষেত্রে পাঠাভাতের আয়োজন করতে বলেন, তবে গরিব মানুষের ক্ষেত্রে মাছ-ভাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। আশি ঊর্দ্ধ শান্ত বর্মন জানাচ্ছেন যে, যৌবনকালে তিনি দেখেছেন অনেক বিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে পড়েছিল পাঁচজনিপাতার অনুমতি না দেওয়ার কারণে। বিমলা দেবী আক্ষেপ করে বলেছেন যে, ওনার বড় ছেলের বিয়ের সময় যথাসময়ে খাবারের আয়োজন না হওয়ার জন্য পাঁচজনিরা উঠে গিয়েছিলেন। অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর পাঁচজনি পাতা আহার গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই পাঁচজনিপাতার সন্তুষ্টি একপ্রকার আবশ্যক ছিল। কিন্তু রাজবংশী সমাজের পরিবর্তনের ধারায় এই নিয়ম ক্রমশ শিথিল থেকে শিথিলতর হচ্ছে। এখন আর পাঁচপাতার অনুমতি আবশ্যক নয়।

শাঁখা-সিঁদুরের ভার : শাঁখা সিঁদুরের ভার নিয়ে যাওয়ার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। দুপুর বা সন্ধ্যার যেকোন সময় এই ভার নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সাধারণতভাবে কনের বাড়ি খুব দূরে না হলে একটু দেরিতে যাত্রা শুরু হয় যাতে করে সন্ধ্যার পূর্বে কনের বাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায়। অনেক সময় দূরবর্তী রাস্তা হলে বরযাত্রী সমেত একসঙ্গে যাওয়ার নিয়ম বর্তমান। এইভাবে যে সমস্ত উপকরণ নিয়ে যেতে হয়, তা হল : এ ঝুঁকি কলা (ষোলোটি মনুয়া কলা, তবে আটিয়া কলা চলবে না), বড় বড় হাঁড়িতে করে দুই হাঁড়ি দই, শাঁখা-সিঁদুর, পান-সুপারি,পুঁটিমাছ পাঁচটা, বড় মাছ দুইটা, মিষ্টি সমেত একজন বৈরাতীসহ আরও জনা দুই/তিনেক লোক কনের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বরের বাড়ির ওই বড় মাছ দিয়েই কনের বাড়ির পাঁচজনি পাতাকে আপ্যায়ন করা হতো। তবে উল্লেখ্য যে, এ ধরনের ভার কিন্তু কনের বাড়ি থেকে বরের বাড়িতে যায় না, বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে আসে।

নারদের ভার : এই ভারে থাকে সামান্য ধানচিড়ে, বাড়িতে বানানো দই, সঙ্গে মনুয়া কলা বা মালভোগ কলা। বলা ভালো যে বরযাত্রীর সঙ্গেই এইভার নিয়ে আসা হয়। যে এই ভার বহন করে নিয়ে আসেন, তাকেই এই দই চিড়ে খেতে

দেওয়া হয়। তবে উল্লেখ্য যে, তিনি আড়াই গাস খাবেন, বাকি খাবার পাতেই থাকবে। বিয়ের পিঁড়িতে বসানোর মুহূর্তে কনের জামাইবাবু কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় এই এঁটো খাবার পা দিয়ে মাড়িয়ে যাবেন। প্রচলিত বিশ্বাস যে, শিবের বিয়েতে এই ভার বহন করেছেন পবনপুত্র শ্রী হনুমান।

জলভরি : শাঁকা সিঁদুরের ভার বেরিয়ে যাওয়ার পর পরেই বাড়ির মা-মেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনরা নিয়ম করে চাইলন বাতি সাজিয়ে নিয়ে বাজনা পার্টি সমেত বেরিয়ে পড়েন জল ভরতে। তবে এই যাত্রাপথে পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যাই অধিক থাকে। নির্দিষ্ট একটি স্থানে জল ভরতে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে থাকা শিব মন্দির, কালীমন্দির, মনসা মন্দির, মাশান মন্দির গুলোতে পূজো দেওয়া এবং বর-কনের জন্য আশীর্বাদ চাওয়া হয়। বৈরাতী পূর্বেই সাজিয়ে নেয় কলার গাছের ঢোনা দিয়ে তৈরি দুটি ভুরা,একটি করে দেওয়ারিতে তেল-সৈলতে দিয়ে প্রজ্বলিত করে; ভুরা দুটির চারদিকে একটি করে নিশান ইত্যাদি দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে নেওয়া হয়। তৈরীর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখা হয়, এই ভুরা দুটি (একটি বরের ও অন্যটি কনের নামে) যাতে যথাস্থানে ভাসানোর সময় ডুবে না যায়। কারণ লোকমুখে প্রচলিত বিশ্বাসে রয়েছে যে, ভুরা দুটির একটি ডুবে গেলে বা একটি অন্যটির থেকে আলাদা হয়ে গেলে সংসারে অমঙ্গল হয়। বলাবাহুল্য, এই প্রচলিত কুসংস্কারগুলি ধীরে ধীরে অনেকাংশে লোপ পেয়েছে এবং শিক্ষিত রাজবংশী সমাজ এগুলিকে মান্যতা দিচ্ছেন না।

গায়ে হলুদ : উভয় পরিবারেই জল ভরা যাত্রা সম্পন্ন হওয়ার পরে বর/কনের গায়ে হলুদ মাখানো হয়। জল ভরতে যাওয়ার পূর্বেই বৈরাতী/অন্যরা বাড়িতে যে ঘাটটি তৈরি করে রেখেছিল, জলভরি যাত্রা ফিরে আসার পর সেই ঘাটে বিয়ের কনেকে গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কনের জামাইবাবু কনেকে কোলে করে বড় ঘর থেকে ঘাটে নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যেই কাঁচা হলুদ বেটে রাখা হয়। ঘাটের সামনে পিরিতে বসিয়ে চালুন বাতি দেখিয়ে, পাখা দিয়ে বাতাস করে কিছু নিয়ম পালনের পর পাত্রীর মা নতুন গামছা দিয়ে পাত্রীর গা মুছে দেন এবং প্রথম হলুদ কনের মা কনের গায়ে লাগিয়ে দেন কনেকে না দেখে। এরপর বৈরাতী, বৌদিরা কনের গায়ে হলুদ মাখিয়ে দেন এবং রসিকতা করে গান করতে থাকেন—

৭

ঢাল কাইয়াটা মোক না দেয় বিচি
বড় দাদার বিয়াও হয় হলদি মাখা ধুতি

ছোট দাদার বিয়াও হয় ন্যারেং ত্যারেং ধুতি
ঢাক কাউয়াটা মোকে না দেয় বিচি।।[৩৩]

৮

কুল বাটে কুলাটি
হলদি বাটে বৈরাতি
নিজ বৈনে হলদি বাটে টকটক করি
পর বৈনে হলদি বাটে শ্যাক শ্যাক করি
ঘাট খোড়ে ঘাটিয়ান ভাই রে, ঘাটত নাই দেয় কড়ি (টাকা)
ঘাটিয়ালের মাইয়াক বন্ধক থুইয়া দিম্ কড়ি।।[৩৪]

এই গানটি অন্যভাবেও গাওয়া যায়—

কুর বাটে কুরাতি হলদী বাটে বৈরাতি
আপন বইন বাটে হলদী ড্যাব ড্যাব করে
পরার বইন বাটে হলদী ম্যাসঅ ম্যাসঅ করে
আইসেক মাই চড়েক উচোল পিড়া।
আইসেক বাপই চড়েক উচোল পিড়া
নাইও হামার পিড়াৎ চড়িবার হউসরে
আসুক বোল জনম ভেন্নিয়ার ব্যাটারে/বেটিরে
তারে সঙ্গ হয়য়া মাখিসু হলদীরে
আসুক বোল পাসুন মারার ব্যাটারে
আইস বাপই চড় উচোল পিড়া
আইস মাই চড় উচোল পিড়া
নাইও হামার পিড়াৎ চড়িবার হাউসরে।।[৩৫]

উল্লেখ্য যে, এই সময় পাত্রীর গায়ে সাদা-লাল পাড়ের শাড়ি থাকে। এরপর বিয়ের কনে পরিচ্ছন্ন হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এর মধ্যেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। নিমন্ত্রিত অথিতিরা আসতে থাকেন এবং এই সময় থেকেই বিয়ের উপহার দিতে শুরু করেন। তবে রাজবংশী সমাজের একটি বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, বরের বাড়ির লোকজন অর্থাৎ বরের বাবা, জ্যাঠা, কাকা প্রমুখ একটা করে গামছা ঘাড়ে নিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের (সাগাই) করজোড়ে আপ্যায়ন করেন।

বরযাত্রীর আগমন : বিবাহের লগ্ন অনুযায়ী বরপক্ষ কনের বাড়িতে আসার

জন্য প্রস্তুতিপর্ব শুরু করেন। আগের থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে যে বরযাত্রী কতজন আসতে চলেছেন। লক্ষণীয় যে, বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বরের কোলে একঝুঁকি মনুয়া কলা থাকে। বিমলা দেবি জানাচ্ছেন যে, পাঁচটি গরুর গাড়িতে করে তার বিয়েতে বরযাত্রী এসেছিল বলে শুনেছেন। তবে সব পরিবারের ক্ষেত্রে বর যাত্রীসংখ্যাটা সমান হতো না। যাইহোক, বিবাহ সভায় উপস্থিত সকলের সঙ্গে রসিকতা সম্পর্ক থাকে না।[৩৬] মূলত বরযাত্রীর সঙ্গে কনের বাড়ির সেই সমস্ত লোকজনের রসিকতা চলত, যারা পাত্র-পাত্রীর ভাই বোন বা দাদা বৌদি স্থানীয়। যেমন—

৯

ঠাকুরি কালাই-মুসুরী কালাইর ডাল মেলিছে
গোসাইরহাটের মানষি গিলা হা মেলিছে
বালতি বালতি জল দিলুং তাও টেবিল ভিজিল না
আর গোসাইরহাটের মানষি গিলা সরমানে জানে না।।

১০

ময়নাতলির তাউংকুর গাদি, ছাতা ধরিলো ছাতা ধরিলো
এই পাইকার দাম কৈচ্ছে তাও নাই দেয় ছাড়ি
শ্যামল পাইকার দাম কৈচ্ছে তাকে দিছে ছাড়ি।।

১১

নয়া কইন্যা নয়া কইন্যা ঢুলিত পাদে
এক ছিলিম তাংকু চালুং তাকে নাদে
নয়া কইন্যা নয়া কইন্যা কাটোলের পাত
নয়া কইন্যা খাইলেক বোলে ভাসুরের ভাত।।

১২

দিদি দিদি কাউয়ায় মরুচ খায়
খ্যাদাও দিদি খ্যাদাও দিদি মরুচের পরান যায়
ভাল ভাল গাবরুগুলা জলে ভাসি যায়
কানা-খোড়া বাপো-মাও ত্যাং ব্যাচেয়া না খায়।।

১৩

ও বৌদি মুখকোনা তোর ডুবো ডুবো
গুয়া কোটে পালু

ঝে বাড়িত তোক যাওয়ার না দোং
ঔই বাড়ি তুই গেলু।।

১৪

আমের গাছত আমসি
হামরা ঠাট্টার মানষি
আমের গাছত আম নাই
ঠাট্টা করি কাম নাই।।

১৫

বাঁশ বাড়ি খান ঝালাউ ঝালাউ
বাঘ-শিয়ালের ভয়
তোমরা ক্যানে আইসলেন বন্ধু
হামরায় গেইলোম হয়।।[৩৭]

বিয়ের পূর্বে বরকে বরি নেওয়া : বরযাত্রী এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ির খলানে একটি কলার গাছ আগে থেকেই গেরে সুন্দর করে মাটি লেপা থাকে। কলার গাছের সামনে একটি পিড়ি রাখা হয় এবং পাত্রকে দাঁড় করানো হয়। কনের বোন বরের পা ধুইয়ে গামছা দিয়ে মুছে দেন। এই সময়ও নানা রকমের রসিকতা করা হয়।

যেমন—

১৬

এতের কুলা ব্যাতের বান ঘিহ পঞ্চ বাতি
নাক ডাংরাটার বরি নিতে বেরায় মুখের হাসি।।[৩৮]

এরপর কনের মা বরকে চাইলন (chalan-bati) বাতি দিয়ে বরি নেন। সেইসঙ্গে মিষ্টিমুখ করান। এরপর কনের পিতা ব্রাহ্মণের মন্ত্রচারণের মাধ্যমে শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার পর পাত্রকে পাঁচ কাপড় উপহার দেন। উল্লেখ্য যে, পাত্র যে পোষাক পড়ে আছেন, সেই পোষাক পরিবর্তন করে ইতিমধ্যে উপহার দেওয়া পাঁচ কাপড় পড়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়।

মারওয়া সাজানো : চারদিকে চারটি কলার গাছ বর্গক্ষেত্রাকারে পোঁতা হয়। মনে রাখতে হবে—কলার গাছ গুলোর পাঁচটি (পঞ্চপান্ডব) কিংবা তিনটি (ত্রিদেব) পাতা থাকা আবশ্যক। H.H. Risley জানাচ্ছেন যে, ‘‘In the courtyard of the house a marua or wedding canopy has been erected, consisting

of five plantain stems, about 3 feet height, arranged in the from of a quincunx, with earthen pot of water placed at the foot of each, the distance between the plantain stems is the distance from the birdegroom's foot to his ear.''[৩৯] বস্তুত, বরের দৈহিক পরিমাপের উপর কলার গাছ পোতানির নিয়ম আলোচ্য সময়কালে অবলুপ্ত হয়েছে। যাইহোক, চারটি কলার গাছের নীচেই একটি করে মাটির ঘট রাখা হয়, সঙ্গে আমের পাঁচ/সাতটি পাতাযুক্ত পল্লব থাকে। উল্লেখ যে এই ঘটগুলি বসানোর পূর্বে মাটিতে ধান দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে ঘটের মুখে গামছা রাখা হয়। এছাড়াও ব্রাহ্মণ সুতো দিয়ে চারটি মারওয়া বেঁধে দেন। সুতোর সঙ্গে আমের পাতা মাঝে মাঝে রাখা হয়। মনে রাখতে হবে, মারওয়ার উপরে অবশ্যই একটি চানদোয়া দেওয়া হয়। তার উপর দুটো কাঁচা সুপারি ও দুটো পান রাখা হয়। কথিত আছে, চাঁদ সওদাগর এর প্রচলন করেন। উল্লেখ্য যে, এই মারওয়া সাজাতে যে অর্থ খরচ হয়, তা বরপক্ষকে মেটাতে হয়। অনুমিত হয়, একজন দরিদ্র রাজবংশী বিবাহেও মারওয়া সাজানোর এই নিয়ম অবশ্য পালনীয়। মারওয়া সাজানোর সময়ও সুর করে ছড়া গান গাওয়া হয়। যেমন—

১৭

মারোয়াক্কে গাড়ো হে, মারোয়াক্কে ডলো হে
ঐ মারোয়ার তলে হে,
ফা(পা)শা খেলার দিদি-দাদার জয়
তাক দেখিয়া নাগে ভয়, দিদি হে
মোর বিয়ার কী ফুল নাই ফুটে
চৌখের জলে ভাসি যায় দানি বুড়ি মুছি যায়
দুখ্ করিয়া চড়ে গাড়িতে।।[৪০]

তবে সম্ভ্রান্ত রাজবংশী পরিবারের ক্ষেত্রে এই বাধ্যতামূলক পালনীয় কর্তব্য ছাড়াও বিবাহের কুঞ্জ নানারকম ভাবে সাজিয়ে তোলা হয়।

ইতিমধ্যেই বিয়ের লগ্নের সময় উপস্থিত হলে বর কনের পিতা পশ্চিম দিকে বসে পূর্ব দিকে মুখ করে। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বর-কনের পিতার ডানদিকে বসবে। এরপর ব্রাহ্মণের মন্ত্র উচ্চারণের এর মধ্যে দিয়ে মারওয়া/মন্ডপ পূজা আরম্ভ হয়। বিভিন্ন শান্তি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণ কনের পিতার মধ্য দিয়ে পাত্রকে মাল্যদান করেন। এরপর শুরু হয় সম্পাদন অনুষ্ঠান।

এইচ.এইচ.রিজলে জানাচ্ছেন (পৃষ্ঠা: ৪৯৭) যে, এই সময় পাত্রীর বাম হাত এবং পাত্রের ডান হাত কাশিয়া ঘাস দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। পাত্রীর পিতা এক এক করে জগ, ঘড়া, এক গ্লাস, থাল, বাটি, বাটা, কলসি, সর্বশেষে দেন বিয়ের টোপর(মুকুট)। এভাবেই সম্পাদন প্রক্রিয়া শেষ হয়। এরপর পাত্রীকে একটা পিড়ায় করে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হয়। পাত্রীকে বিয়ের পিঁড়িতে আনার সময় দুটো পান পাতা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা হয় এবং পাত্রের ডান দিকে বসানো হয়। এরপর উভয় পক্ষ দাঁড়িয়ে পড়েন এবং ঢেলাঢেলি অনুষ্ঠান শুরু হয়। মাঝখানে একটি শাড়ি রেখে ফুল, আতপ চাল, খই, দিয়ে বর কনেকে এবং কনে বরকে অভিনন্দন করে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কনে একবার করে পুষ্প বর্ষণ করেন এবং একবার করে দাঁড়ানো অবস্থায় পিঁড়ির ওপর ঘোরেন। এইভাবে সাতবার ঘুরে ঘুরে পুষ্প বর্ষণের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। এরপর উভয়পক্ষের মাঝামাঝি রাখা শাড়িটি উপরে তুলে ধরা হয়, এইসময় শুভ দৃষ্টি সম্পন্ন হয়[৪১] এবং শাড়ীর নীচেই মাল্যদান অনুষ্ঠান শুরু হয়, কনে প্রথম বরকে মাল্যদান করেন, এরপর বর কনেকে মাল্যদান করেন। এভাবে তিনবার একে অপরকে মাল্যদান করে থাকে। মালা বদলের পর কনেকে ডান দিক থেকে বাম দিকে এনে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হয়। এরপর বরকনেকে বসিয়ে একটা কলসির উপর হাত রেখে ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে বেলপাতা, ফুল হাতের তালুতে রাখা হয়। এরপর কনের পিতা কলসির উপর রাখা পাত্র-পাত্রীর হাত বেলপাতা, ফুল সমেত কাশিয়া দিয়ে বেঁধে দেন। এই সময় নাপিত কনের আঁচল এবং পাত্রের কাপড় একত্র বেঁধে দেন। এদিকে যে কাশিয়া দিয়ে পাত্র-পাত্রীর হাত বেঁদে দেওয়া হয়েছিল তা খুলে দেওয়া হয়/ কিংবা নাপিতের আসি (খুর) দিয়ে কাশিয়াটি কেটে দেওয়া হয়।

জলছিটা : এরপর শুরু হয় জল ছিটা/পানি ছিটা উৎসব। বহুল প্রচলিত এই লোকাচারটির মাধ্যমে দুটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ড. মাধবচন্দ্র অধিকারী বলেছেন যে, এটি একটি আত্মীয়তা বাড়ানোর প্রক্রিয়া। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বিবাহে এই ধরণের অনুষ্ঠান রাজবংশী সমাজে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যা অ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ সম্প্রদায়ের বিয়েতে এই ধরণের অনুষ্ঠান না করলেও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের বিয়েতে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগ্রহে জল ছিটাতে দেখা যায়। মূলত কাকু-কাকিমা, জ্যাঠু-জেঠিমা পর্যায়ের পাড়া প্রতিবেশি কিংবা মনের দিক থেকে খাপ খায় এমন কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে তাকে বিবাহ ঠিক হওয়ার পরে পরেই জানিয়ে দেওয়া

হয়। পূর্ব নির্ধারিত ব্যক্তিরা মারওয়ার নিচে রাখা ঘটের থেকে আমের পল্লবে করে জল বর-কনের মাথায় ছিটিয়ে দেন। বিয়ে দিন এই জলছিটা বাবা-মা সারাদিন উপোস করেন। যাইহোক, এরপর পাতানো পিতা মাতা পাত্র-পাত্রীকে উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করেন। ধনেশ্বর বর্মণ জানাচ্ছেন যে, এই জলছিটা বাবা-মা মারা গেলে জলছিটা 'বেটা-বেটি'কে তিন দিন অশৌচ পালন করতে হয়, শ্রাদ্ধশান্তি করতে হয়, এমনকি কেউ কেউ হবিষ্যিও করে থাকেন।[৪২] যাইহোক, এরপর আত্মীয়রা এক এক করে উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ আম খড়ি, গোবর, বিল্লপত্র দিয়ে হোম জ্বালান। এদিকে পাত্র-পাত্রী ও তাদের আত্মীয় স্বজনরা বিয়ের পিঁড়িতেই বসে কড়ি (সাতটি কড়ি) খেলতে থাকেন। সেই সঙ্গে কটুয়া খেলা হয়। উল্লেখ্য যে, পাত্রী এই সময় পাত্রকে কাজলের টিপ পরিয়ে দেন। অন্যদিকে, বর কনেকে সিঁদুর দান করেন। এরপর বর তাঁর বউকে আয়না দেখান।

এরপর পাত্র-পাত্রী উভয়ই উঠে দাঁড়ান এবং ইতিপূর্বে জ্বালানো হোমে পাত্রী কলার পাতায় একটি মনুয়া কলার ঝুঁকি দুই হাত দিয়ে সামনে ধরেন ও বর কনের পিছন থেকে কনের হাতে হাত রেখে কলার ঝুঁকিটি ধরতে সহযোগিতা করেন এবং পাত্রীর ভাই সেই ঝুঁকি হতে খই হোমের উপর ফেলতে থাকেন। এইভাবে হোম ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পুরোহিত মশাই বর কনেকে হোমের কাজল দিয়ে টিপ পরিয়ে দেন। এরপর শুরু হয় সাত পাকে বাঁধা। ইতিমধ্যেই সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা সাতটা পান-সুপারি কনে প্রত্যেকবার ঘোরার সময় পা দিয়ে একটা করে ছোঁয়াবেন এবং পাত্র সেই পান পাতা পা দিয়ে সরিয়ে দেবেন। মনে রাখতে হবে, এই সাত পাক ঘোরার সময় কনের মা সবার সামনে থাকবেন, তিনি তালের পাখায় করে জল ছিটিয়ে পথ দেখিয়ে যান এবং বৈরাতি চাইলন বাতি হাতে নিয়ে নাচতে থাকেন, কেউবা ফুল ছেটাতে থাকেন, সেইসঙ্গে পাত্র পাত্রীর পিছন পিছন আত্মীয়-স্বজনরাও নাচতে নাচতে সাঁতপাক প্রদক্ষিণ করেন।

এরপর বর-কনে পুরোহিত মশাইকে প্রনাম করে আত্মীয়-স্বজন বড়ঘরের (উত্তর দিকের ঘর) দিকে যান। বৌদিরা বোনেরা আগের থেকে প্রস্তুত থাকেন পাত্র-পাত্রীকে আটকে দেওয়ার জন্য। কারণ তারা বিয়েতে অনেক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তার জন্য তাদের কিছু পুরস্কার চাই। তারা বড় ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে (কোয়াইর ধরা) যাতে তাদের পাওনা না দিয়ে বর-কনে ঘরে ঢুকতে না পারে এবং রসিকতা করে অনেক রকমের ছড়া বলতে থাকে, যেমন—

১৮

ইরকিচি কোয়ারি সৃরিষ্টি বান্ধা
মুই বইনে ধরলুং কোয়াইর বড় আশা করিয়া
ভাউযের হাতের শাংখা নিম্
তেমনে কোয়াইর ছাড়ি দিম্।।[৪৩]

১৯

নাউ ঝুম্ ঝুম্ করে জাংঐ হেলি পড়ে
এত ব(য়)সে বালি হে আইছেলন বাবার ঘরে
তোমার বাপের কী নজ্জা নাই
বিয়াও ক্যানে দেয় নাই।।[৪৪]

যাইহোক, ঘরে ঢোকার পর সেখানেও কড়ি খেলা হয়। এরপর বাইরে বেরিয়ে এসে বাড়ির পশ্চিম প্রান্তে তৈরি ঘাটেও আংটি খেলা হয় বর ও কনের মধ্যে। কে কত চতুর এই সব খেলার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। এসব প্রমোদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বর-কনে একসাথে বাড়ির বড়দের কাছে আশীর্বাদ নেন। তবে এ সমস্ত কিছু করতে করতে ভোর হয়ে আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরের দিন সকালে কোয়াইরধরার পরবর্তী পর্ব চলিতে থাকে। বিদায়ের পূর্বে পাত্রীর বাবা কুচ ছিড়ে একটি গামছা, দুটো পান ও দুটো সুপারি পাত্রের হাতে তুলে দেন এবং বলেন—

২০

এতদিন থাকিল মোর খ্যাড়ের জুড়া
আইজ থাকি গেল তোমার মাতামুড়া।।[৪৫]

এই সময় কনে মায়ের ঋণ পরিশোধ করার জন্য মুখ ঘুরিয়ে মায়ের কোলে সাত মুঠি চাল অর্পণ করেন এবং মা মেয়ে সমেত পরিবার পরিজন কান্নাকাটিতে আকুল হয়ে ওঠেন। কনের মা কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন—

২১

বড়ঘরের নোকাটা,মোর মা'রে খোপাটা
আজি হাতে ব্যাড়েয়া গেইল, হলহলা দাম্রিটা
দালা দালা খকড়া ভাত, চওলা চওলা পুটি মাছ
আইজ হাতে না খাইবে আর।।[৪৬]

২২

ভইষের গাড়িখান ক্যারক্যারায়
মোর মাক থুইয়া যাও
মোকে না(হ)য় নিয়া যাও।।[৪৭]

যাবার সময় কনের ভাই/দাদা বর-কনের গাড়ির চাকায় জল ঢেলে দেন যাতে করে যাত্রা শুভ হয়।

বরের বাড়িত আগমন : এইচ.এইচ.রিজলে জানাচ্ছেন যে, ''রাত্রি (বিয়ের দিন) ভোজনে কাটানো হয় এবং পরদিন খুব ভোরে বর কনেকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। এখানে এক ধরণের নকল অনুষ্ঠান চলে, এটি বাসি বিবাহ নামে পরিচিত। চারজন বৈরাতি থাকেন পালকি থেকে কনেকে নামানোর জন্য এবং এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা জন্য''[৪৮] কিন্তু আলোচ্য সময়ের শেষের দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দরুন পালকি ও গরুর গাড়ির পরিবর্তে, পেট্রোল-ডিজেল চালিত চার চাকাওয়ালা গাড়ি থেকে নেমে বর-কনে বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং প্রথমে একটি বড় পিড়ির উপর দাঁড় করানো হয়। এই প্রসঙ্গে ড. ধর্ম নারায়ণ বর্মা জানাচ্ছেন যে, ''বিয়ার পাছের দিন সকালে বর কইনাক পিড়াত খাড়া করা হয়। বৈরাতি উমাক গাও ধোঁয়ায়। কাপড় পেন্দা হইলে উমাক চাইলন বাতি দেখায় বৈরাতি। বৈরাতির জোকারে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়। ইয়ার পাছত বর কইনার কপালত সেন্দুর তুলি দেয় হাতত্ শাখা তুলি দেয়। এই সমাইত জোকার দেওয়া হয়।[৪৯] অন্যদিকে রমনীমোহন বর্মা জানাচ্ছেন যে, ''মূল বিবাহের অনুষ্ঠান শেষে ঐ রাতেই বাসী বিবাহ সম্পন্ন করা হয়। জলপাইগুড়ির শহর এলাকায় কদাচিৎ কেউ কেউ পরের দিন বাসী বিবাহের আয়োজন করলেও তা বুঝতে হবে অসবর্ণ বিবাহ কিংবা পূর্ববঙ্গীয় মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবে সংঘটিত হয়েছে।[৫০] বরের মা চাইলন বাতি নিয়ে নতুন বউকে বরণ করে নেন এবং মিষ্টিমুখ করান। বরের মায়ের পরে বৈরাতি বরণ করে নেন, নতুন বর—কনের সাড়ে রসিকতায় মেতে ওঠেন। এরপর একটি কাঁসার থালার উপর আলতা রেখে কনে তার উপর দাঁড়ান এবং একটি সাদা ধুতি উপর পা রেখে বড় ঘরে প্রবেশ করেন, পিছন পিছন বর এগিয়ে যান। সুকারু বর্মন জানাচ্ছেন যে, রাজবংশী সমাজের বিয়েতে এ ধরণের নিয়ম আগে তিনি দেখেন নি। কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের নিয়ম পালন সহজেই চোখে পড়ছে। এরপর বর-কনে একসাথে ঠাকুর প্রণাম করেন। এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে বরের বাবা-মা, বাড়ির বড়দের কাছ থেকে অশীর্বাদ নেওয়া হয়। এরপর ঠাকুর ঘরে কড়ি খেলা হয়। আবার কোথাও কোথাও বিবাহের একদিন

পর বৌভাতের আয়োজন করা হচ্ছে, যেটা নিঃসন্দেহে একটি মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করছে।

তথ্যসূত্র :

১। মহাপাত্র, অনাদি কুমার, বিষয় সমতত্ত্ব : প্রত্যয় ও প্রতিষ্ঠান, সুহৃদ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ: ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা:৩৫০।

২। রায়, নিখিলেশ (সম্পা:), বৈরাতি, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ভলিউম-১, ইস্যু-১, ২০১২, পৃষ্ঠা-৭৭।

৩। বর্মন, ধনেশ্বর, উত্তরবঙ্গের জীবন ও লোকাচার, প্রগতি পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৪২।

৪। বর্মন, ধনেশ্বর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৭।

৫। সুর, অতুল, ভারতে বিবাহের ইতিহাস, শঙ্খ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-১৪।

৬। অধিকারী, ড. মাধব চন্দ্র, রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, প্রথম খণ্ড, পাইকান পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ : ২০১৪, পৃষ্ঠা: ৫১।

৭। এইচ.এইচ.রিজলে, The tribes and castes of Bengal, vol-1, Bengal Secretariat Press, 1st Edition: Calcutta, 1891, page:496

৮। এইচ.এইচ.রিজলে, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯৬।

৯। রায়, জ্যোতির্ময়, রাজবংশী সমাজ দর্পণ ২, দি সী বুক এজেন্সি,প্রথম প্রকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১২৭।

১০। সান্যাল, চারুচন্দ্র, The Rajbanshi of North Bengal, The Asiatic society, First pullished in 1965, page-90.

১১। সান্যাল, চারুচন্দ্র,পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৯।

১২। বসু, স্বরাজ, Dynamics of a caste movement, The Rajbanshi of North Bengal, 1910-1945, Manohar, First pulication-2003, page-41.

১৩। বসু, স্বরাজ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪২

১৪। অধিকারী, ড. মাধব চন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১।

১৫। অধিকারী, ড. মাধব চন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১। এখানে উল্লেখ্য যে, রায় সাহেব মনীষী পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলেন

এবং তার দরুণ ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারিতে পৃথক ক্ষত্রিয়জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৬। কর, অরবিন্দ (সম্পা:) কিরাত ভূমি, জলপাইগুড়ি, জেলা সংকলন, ১ম খণ্ড,প্রথম প্রকাশ: ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৫৫।

১৭। সান্যাল, চারুচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ৯১।

১৮। পাত্রপক্ষ/পাত্রীপক্ষ একটি নির্দিষ্ট শুভ দিন দেখে বিবাহের সম্বন্ধ নির্ধারণ করে থাকেন।

১৯। রাজবংশী সমাজে কন্যাপণ 'খাল্তি' নামে পরিচিত ছিল। বিংশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই প্রথা অবলুপ্ত হতে থাকে।

২০। 'দুদিয়া গাবুর' বলতে দ্বিতীয় পাত্রকে বোঝানো হয়।

২১। হান্টার, ডব্লিউ. ডব্লিউ, A Statistical Account of Bengal, Koch Behar, N.L.publishers, First published, Trubner & Co, London, page:44

২২। হান্টার, ডব্লিউ. ডব্লিউ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫।

২৩। গাজী, ড. আব্দুল রহিম (সম্পা:), কুচবিহারের লোকসংস্কৃতি : বহুমাত্রা বহুস্বর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা, ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১৯৬।

২৪। কর, অরবিন্দ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫২৭।

২৫। রায়, দিলীপ কুমার ও নাথ, প্রমথ, লোকায়ত আঙ্গিনায় উত্তরবঙ্গ, ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, প্রথম প্রকাশ : ২০১০, পৃষ্ঠা-১০৩।

২৬। দে, ড. দিলীপ কুমার, কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি, অণিমা প্রকাশনী,প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী, ২০০৭, পৃষ্ঠা-২৩৯।

২৭। বর্মা, ধর্ম নারায়ন, কামরূপ-কামতা সংস্কৃতি : আর্য সংস্কৃতির নামান্তর, অন্তময় প্রিন্টার্স, পুনর্মুদ্রণ: ২৮শে জুন, ২০২০, পৃষ্ঠা: ২৩-২৪।

২৮। সান্যাল, চারুচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৬।

২৯। বর্মন, বিমলা, সাক্ষাৎকার, শীতলখুচি, বয়স ৮৫, তারিখ: ১৫-০৫-২০২২(ইং)।

৩০। বর্মন, বিমলা, পূর্বোক্ত।

৩১। বর্মন, সুকারু, সাক্ষাৎকার, গোসাইরহাট বন্দর, বয়স ৬২, তারিখ: ২০-০২-২০২০(ইং)।

৩২। বর্মন, বিমলা,পূর্বোক্ত।

৩৩। বর্মন, মিনু, সাক্ষাৎকার, গোসাইরহাট বন্দর, বয়স ৫০, তারিখ: ১০-০২-২০২০ (ইং)।

৩৪। বর্মন বিমলা, পূর্বোক্ত।

৩৫। রায়, নিখিলেশ (সম্পা:), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮১।

৩৬। রায়, ড. নরেন্দ্রনাথ, সভ্যতার সংস্কৃতির সন্ধানে : উত্তরবঙ্গের লোক দেবদেবী ও লোকাচার, রবীন্দ্র প্রেস, প্রথম প্রকাশ : উত্তরবঙ্গ বইমেলা, ২০১২, পৃষ্ঠা-৪৪।

৩৭। বর্মন, মিনু, পূর্বোক্ত।

৩৮। বর্মন, মিনু পূর্বোক্ত।

৩৯। এইচ.এইচ.রিজলে, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ৪৮৭।

৪০। বর্মন, মিনু,পূর্বোক্ত।

৪১। সাহা, বিপ্লব কুমার, লোকসংস্কৃতি : উত্তরবঙ্গ ও আসাম, এন. বসাক এবং অ্যাসোসিয়েট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : দোল পূর্ণিমা, ২০১২, পৃষ্ঠা: ৮৫।

৪২। বর্মন, ধনেশ্বর, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ৯৮।

৪৩। বর্মন, বিমলা, পূর্বোক্ত।

৪৪। বর্মন, মিনু, পূর্বোক্ত।

৪৫। বর্মন, শান্ত, সাক্ষাৎকার, গোসাইরহাট বন্দর, বয়স-৭৮, তারিখ ১০-০৭-২০২০।

৪৬। বর্মন, ভারতী, সাক্ষাৎকার, গোসাইরহাট বন্দর, বয়স-৬২, তারিখ ৮-৫-২০২০।

৪৭। বর্মন, নিরোবালা, সাক্ষাৎকার, গোসাইরহাট বন্দর, বয়স-৬৫, তারিখ ৮-৫-২০২০।

৪৮। এইচ.এইচ.রিজলে, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯৭।

৪৯। বর্মা, ধর্ম নারায়ণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ২৪।

৫০। কর, অরবিন্দ (সম্পা:), কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন, ২খণ্ড, ডটলাইন প্রিন্ট এন্ড প্রেসেস, প্রথম প্রকাশ : ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা: ৫৩০।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. কার্তিক সাহা, অধ্যাপক ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, অধ্যাপক ড. মাধবচন্দ্র অধিকারী, অধ্যাপক ড. কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর, অধ্যক্ষ ড. আফজাল হোসেন, অধ্যাপক অমৃতকুমার শীল, অধ্যাপক হরেকৃষ্ণ সরকার, অধ্যাপক ড. পরিমল বর্মণ, শিক্ষক বিশ্বনাথ প্রামানিক এবং গবেষক ড. প্রসেনজিৎ রায় মহাশয় প্রমুখ এই প্রবন্ধটি লেখার কাজে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়াও স্নেহভাজন কোয়েল সরকার, রিন্টি সাহা, তিথি বর্মণ, রূপা সাহা প্রমুখ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আমি তাদের কাছেও চিরঋণী।